বীরবংশীয় রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি নিয়ে সে অগ্রসর হয়। ঠাকুরঝি এই রূপ সহ্য করতে না পারলেও বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে। "বসন্ত প্রসন্ন মুখে নিতাইয়ের প্রতীক্ষা করে থাকে। এবং নিতাইয়ের বাহু বন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পিষ্ট" হতে থাকে।

নিতাই বসন্তকে অন্যরূপে দেখে যেদিন কানা খোঁড়া লোকেদের জন্য সে সমবেদনায় কাঁদে। পরে জল মুছে বসন্ত যে হাসি হেসেছে— "সে হাসি বিচিত্র হাসি এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই।" তবু নিতাই এই ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্তি চায় পালিয়ে যেতে চায় কোনো অজুহাত দিয়ে। অথচ যে রাতে বসন্তের চড় থেকে মদ খেলে আসরে শ্রোতাদের মন মত চরমতম অশ্লীলতায় মাতিয়ে তোলে। আসরের শেষেও নিতাইকে মদের গ্লাস দেয় বসন্ত। 'এই বসন্ত যেন নতুন বসন্ত ...।" বসন্ত নিতাইকে অনেক শিখিয়েছে জানিয়েছে 'পদাবলীর পীরিতি' আর 'টপ্পার ভালোবাসা' এক নয়। অসুস্থ বসন্তকে যে গান শুনিয়েছে—

"এই খেদ মোর মনে
ভালোবেসে মিটলো আশ কুলালো না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

অসুস্থ নিতাই কেন এ গান বাঁধলো প্রশ্ন তার। কিন্তু তাদের অভ্যাসের নেশা ও মাসির আদেশ, মানতে হয়। মনের মানুষ থাকলেও এদের জীবনে 'প্রেম শরতের মেঘের মতো, আসে চলে যায়।' এক সময় বসন্ত মারা যায়। "জীবন এত ছোট কেনে?' গানটি অসমাপ্তই থেকে যায়। মৃত্যু তাড়িত জীবনের গান তো অসমাপ্তই থাকতে বাধ্য। জীবনের গান অশেষ। জীবনের গান অন্তত। এই গান বসনের জীবনের সত্য হয়ে গেল। জীবনে যা পাওয়া যায় না মরণে কি তাই পাওয়া যায়—

"জীবনে যা মিটলো না কো
মিটবে কি তাই মরণে?"

নিঃসঙ্গ নিতাই দল ছেড়ে চলে যায়— কাশী যায়। সেখানে ভাষা আলাদা। আবার দেশের পথ ধরে নিতাই এক্ষেত্রে বলা যায়— 'কেলিনু শৈবালে ফেলি কমল কানন।'[১৪] মা মাটি মানুষের টানে ফিরে আসে দেশের স্টেশনে, এসে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বসে। ঠাকুরঝিও মারা যায়। ঠাকুরঝি ও বসন্ত যেন—'লাইন যেখানে বাকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয় সেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে উভয়কেই দেখিতে পায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—"তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

আঘাতে স্থূল আদিরসাত্মক যৌনতা নির্ভর ঝুমুর গানের অসামান্য শিল্পীত গদ্যরূপ, এরূপ— "বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল— কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিলনা। কিন্তু মরতে মন চাইছে না। ... নিতাই দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মতো তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল— ভয় কি? রোগ হলেই কি মরে বসন?" নিতাই বসনকে এও বলেছে— ছি! রোগা শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন।" নিতাইকে ওস্তাদ বলার সময় নিতাই লক্ষ করে— "মেয়েটা শুধ মুখ ভরিয়া হাসে না সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার। মানুষের মনের মনটাকে কাটিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ধুলায় ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।" হাসি বসন্তের অভ্যাস আদিরসাত্মক দেহজীবী হিসাবে-তা না হলে দলে রাখব কেন? নানা ভঙ্গিমায় পুরুষদের আকর্ষণ করতে হয় বসন্তও ব্যতিক্রম নয়। এই বসন্ত স্টেশনে নয়ন শেখের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিতাইয়ের ঘরে গেলেও রাতে সকলের অজান্তে নিতাইয়ের ঘর ছেড়ে তার কাছেই চলে যায় এই বসন্ত সেই বসন্ত যাকে আলেপুর মেলায় অন্যরূপে দেখা যায়। এই বসন্ত এখানে ধর্ম-কর্মও করে। লক্ষ্মী-ব্রতের উৎসবে বসন্ত নিষ্ঠাবতী। যা কবিয়াল নিতাই কে মুগ্ধ করে এবং বসন্ত পুরাণ মহাজনীপদও জানে আবার ওদের কেন্দ্র করে যৌনপল্লী বসে ও মধুচক্রের আসর জেগে ওঠে। তার হাসি সম্পর্কে নিতাইয়ের মত হল— "এমন ধারালো খিলখিল হাসি বসন্ত এ বোঝে যে নিতাই তাকে চা করে দেয়, গায়ের ধুলো ঝেড়ে দেয়— তাই ঘরের খদ্দেরকে নিতাইয়ের আগমনে বসন্ত তাড়িয়ে দিলে মাসি বলে— "এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি! খদ্দের লক্ষ্মী— তাড়িয়ে দিতে নাই।" এমন কি মাসি একসময় বসন্তকে বলে— "তাহলে বাছা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না। তোমার পথ দেখ। ঝুমুর ক্লেদাক্ত পথ থেকে বেড়িয়ে আসতে চায় তারাই এরকম বলে— দূর, দূর, রোজগার, পাতি নাই, লোক নাই, জন নাই-কিছুই নাই। সব ভোঁ ভোঁ" এই দেহজীবিনী নারীর আজীবন বহু ভোগের নেশা। পরপুরুষ দেখলেই 'বসন্তের মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল।" এই বসন্তই নেশা ছুটলে কল্পনা করে— "কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে।" কিন্তু পারে না- কারণ কে কোথায় আপন হয়ে আছে তাহার? ওই মাসী নির্মলা ললিতা ছাড়া।" সেজন্যই অসুস্থ বসন্ত— 'ছিলা ছেড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল— না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামী পুত্র ঘর-সংসার কি দিয়েছে।" আবার এই বসন্ত নিতাইয়ের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ থেকে গেয়ে ওঠে—

"বধুঁ তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে
তেজী জাতিকুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে।"

ঝুমুর দলের মূল আকর্ষণ দেহজীবি বসনের একসময় দল ত্যাগ করার বাসনা প্রবল হয়, মনের প্রবল পরিবর্তন হয়। এক আকাশ লজ্জা তাকে পেয়ে বসে। বাঁচতে চায়— যা মাসি ছাড়া অন্য কেউ জানে না— বসন্ত মনের মানুষ নিতাইকে বলেছে। সে নিতাইয়ের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু নিতাইয়ের কাছে তাকে হার মানতে হয়। নিতাইয়ের মদের নেশায় প্রাগৈতিহাসিক বীরবংশীয় রক্ত ঝলকে ওঠে বসন্ত যা অবহেলা করতে পারেনি, ধরা দিলো উশৃঙ্খল বর্বর

মূলত বলা যায় 'বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরেও সরিয়ে দেয়— নিতাইয়ের কবি হবার মূল প্রেরণা ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝিকে ভালোবাসার স্পষ্ট অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে তা কিভাবে সম্ভব। ঠাকুরঝির প্রথমত ধর্ম আলাদা দ্বিতীয়ত, পরস্ত্রী। কিন্তু চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ। এই ভাবনায় নিতাই গান বাঁধে-একের পর এক আর বলে—"হায়, হায়, হায়। একি বাহারে গান! ওগো ঠাকুরঝি। ওগো, কি ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালোবাসিয়াছিলে, তাইতো... গান অনুরাগে চঞ্চলতা নেই গভীর জলের মতোই নীরবতা আছে, আবার নিতাইয়ের ঘরে বসনকে দেখে নীরবেই চলে গেছে। সে অজান্তেই দেহ-মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে নিতাইকে, চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে, নিতাইয়ের কবিসত্তাকে প্রেরণা দিয়েছে— আবার নিতাইয়ের জীবন থেকে নীরবে চলেও গেছে। কবি নিতাইয়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মধ্যে এক ধরনের নিরাসিক্ত দেখা যায়। মূলত সৃষ্টিশীল স্বভাবের মধ্যে আসক্তি—নিরাসক্তির দ্বৈত লীলা দেখা যায়, কবি নিতাইয়েরও। এই ভাবনায় ভাবিত নিতাই বার্তা দিতে চায়—'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।' ঠাকুরঝিকে সে গভীরতম ভালোবাসত সেজন্যই দেখা যায় বহু চেষ্টায় চোখের জল ফেলে বিরহ কাতর গান সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঠাকুরঝিকে ছেড়ে আসে— 'না, না তাও করো মার্জনা-আজ থেকে আর তাও দেখব না।' সব মিলে 'ঠাকুরঝি' 'পীরিতির লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পড়িতে সুখ' ভেবেই উন্মাদিনী হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত' পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ভাবনায় ঝুমুর দলের স্বৈরিণী বসন্তের জীবনে বাস্তব; কারণ ঝুমুর দলের গানের অন্তরালে রয়ে যায় দেহপ্রসারিণীর ব্যবসা। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের এক বিখ্যাত চরিত্র বসন্ত। যখন নিতাই বুঝেছে ঠাকুরঝিকে ছেড়ে যেতে হবে তার প্রাক মুহূর্তেই ঝুমুর দলটি স্টেশনে আসে। বসন্তের আগমন হঠাৎ তার আচার আচরণ চলন বলন সব মিলে সে ঝুমুর দলটির কেন্দ্র বিন্দু। লেখক তারাশঙ্করের চরিত্রটি প্রত্যক্ষ করা।

তারাশঙ্কর লিখেছেন— আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোন মেলা ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। ... মেয়েটি ছটফট করছে ... অদূরে আছে মাসি। আর একটা পুরুষ;যে বসন্তের ভালোবাসার জন্। ... বললে আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু, এরা হয়তো জ্যান্ত ফেলে পালাতো; আমাকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে দিত।"[১২] এদৃশ্যও লেখকের প্রত্যক্ষ করা। এই জন্যই দেখি বসন্ত মারা গেলে দলের মাসি সব সোনার অলংকার খুলে নিয়ে বলে— "আমি হলাম ওয়ারিশান" এমনকি কোন দলের মেয়ে মারা গেলে পুরুষেরা শবদেহ স্পর্শও করে না।—"দোহার-ললিতার ভালোবাসার মানুষ-সে মুখ ফুটিয়া বলিল— ওস্তাদ, যা করছে করুক। ... আবার কেনে?" নিতাই একা গঙ্গার ঘাটে শবদেহ সৎকার করল, সাহায্য করলো মেয়েরা, পুরুষরা কেউ নয়। কিন্তু লেখক চেয়েছেন যে বসন্তের ভালোবাসার মানুষটির প্রেমের স্পর্শেই স্বর্গীয় রূপ বসন্ত পেয়েছে।

এক কথায় সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঝুমুর দলের মানব-মানবীর চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। নিতাই বসন্ত, নিতাই ঠাকুরঝি সম্পর্ক ঘটনা পরস্পর বিশ্লেষণ করলে পরকীয়া প্রেমের জ্বালা ও মাধুর্যের চিত্র স্পষ্ট। নিতাই ঠাকুরঝি এর প্রেম বিরহ সম্পর্কের

হয়ে ওঠে ঠাকুরঝি। আর একের পর এক গান সে সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যদিকে ঠাকুর পত্নী হওয়া সত্ত্বেও নিতাই কবিয়াল-এর সঙ্গে এক প্রেমের বন্ধনে ধরা দেয়। যেমন পরবর্তীকালে রাধার মতই বলতে হয়—

"বধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে"

টাকার অভাবে নিতাই ঠাকুরঝির কাছে থেকে দুধ দেওয়া বন্ধ করার কথা বললে সে পয়সা ছাড়াই বাবার কাছ থেকে গাইয়ের দুধ দিতে রাজি হয়— প্রশ্ন হল ঠাকুরঝি নিতাইয়ের জন্য অনেক ত্যাগ করতে রাজি। কিন্তু কেন? স্বামী বর্তমান, আর্থিক দিকে সচ্ছল— কেন অভাব নেই তবুও-বিচিত্র মানুষের মন। যদি আমরা এভাবে দেখি পরস্পরের টানাপোড়েন— ঠাকুরঝির স্বামী ঠাকুরঝি নিতাই বসন্ত — বসন্তের মৃত্যু—নিতাইয়ের বিবাগী হয়ে কাশী যাত্রা।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে চরিত্রগুলোর আঁতের কথা বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। দেখা যাচ্ছে ঠাকুরঝির স্বামী বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু পরপুরুষে আসক্ত হয়েছে, কিসের অভাব ছিল তার, এ তার কোন 'বোধ' সে বলেছে— 'তুমি' যে কবিয়াল কত বড় নোক!' কবিগানের আসরে সে যুদ্ধ শ্রোতা। কিসের এই মুগ্ধতা? নিতাই তার জীবনের কে? এই প্রশ্ন একবারও ঠাকুরঝির মনে আসেনি। তার দাম্পত্য জীবনে সব থেকেও কোথায় কী মরিচীকার আবহ ছিল? আমরা উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইয়ের কথা দেখি— 'তাহার সুখের সংসার' তাহলে কেন ঠাকুরঝি পরকীয়ায় আসক্ত হলো? এই পরকীয়া প্রেমের জালেই তাদের পবিত্র সম্পর্ককে বিষাক্ত ও দুর্বিষহ করে তোলে অবিশ্বাসের ছোবল বিশ্বাসের ইমারতকে অনবরত ধাক্কা মারে। এইজন্যই দাম্পত্য জীবনের অটুট বন্ধনকে দৃঢ়তর রাখার তাগিদে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পরকীয়া প্রেমের অক্টোপাস থেকে শত হাত দূরে অবস্থান করা উচিত। উভয়ের উচিত 'তিল আধ পাসরিতে নারি' ভাবনায় ভাবিত হওয়া। নিতাই নিজেকে অনেকটা গুছিয়েছে, সেদিন ঠাকুরঝি নিতাইয়ের ঘরে বসতে চেয়েছে সেই দিন নিতাই বলেছে— "ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে আশা ঠিক নয়।... বিশ্রাম কর যদি তোমার দিদির বাড়ি রয়েছে। আমি একা বেটাছেলে বাড়িতে থাকি। পাঁচ জন দুষ্য ভাবারতো দোষ নাই।" (পৃ. ৫৬) এরপরেও নিতাই গান বেধেছে—

"বলতে তুমি বলো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমি পুড়ি মন আগুনে।"

পরবর্তী সময়ে বসনের মাথা টিপতে বসে নিতাই। লেখক এর বর্ণনায়—'জালানার পাস হইতে কে সরিয়া যাইতেছে? ... নিতাই যাহা দেখিল সেই জানে।.. ঠাকুরঝি।' 'দশ পরিচ্ছেদের (শেষ) ঠাকুরঝি হারিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের সবই যেন শেষ হয়ে যায়। দেবাংশীর কাছে ঠাকুরঝি ওস্তাদ কবিয়াল এর নাম বলেছে— তিনটার ট্রেনের শব্দে রাজা সচেতন হয়ে নিতাইকে সচেতন করলে— নিতাই উঠিয়া আসিয়া কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় উদাসীন স্তব্ধ হয়ে নিতাই ভাবিতেছিল পথের কথা। কোন পথে গেলে যে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ নইলে – জীবনে শান্তি পাইবে সে?" (পৃ. ৯৭)

ধীরে জাগিয়া উঠে। ... মাটির ভেতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিমস্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। ... এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। ... আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পরিল।" (পৃ. ১২৯) বসন্তের মৃত্যু এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। শেষে দেখা যায়—" ছিল ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার ওপর লুটাইয়া পরিয়া বসন্ত"... ধীরে ধীরে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।"

বসন্তের মৃত্যুর পর নিতাই দাহ করলো। 'পরবর্তী সময়ে মরণ কি?' এই ভাবনা তাকে পেয়ে বসে। এছাড়াও 'জীবনে যা পাওয়া যায় না মরণে কি তাই মেলে?' আবার গান গায়—"জীবনে যা মিটলো না কো মিটবে কি হায় মরণে?"

নিতাই মন প্রাণ দিয়া বসনকে ভালোবাসতো বলেই ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইলেও পারেনি। এমনকি বসন্তের দাহের পর রাতে তার চিতায় চলে যায় খোলা চোখের সামনে সে বসন্তকে কোথাও দেখেনি কিন্তু নিতাই চোখ বুঝলেই 'সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠলো। মনে হইল বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বসন্ত! রবীন্দ্রনাথ কথিত 'এ জগতে কিছুই মরে না।' (প্রভাত সঙ্গীত, অনন্ত জীবন) বা 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতায় পাই—

"নয়নে সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

এরপর ২১ অধ্যায়ে ঝুমুর দল ত্যাগ করে কাশী যায় নিতাই। ওখানে ভালো লাগে না। ও মনে পড়ে বাংলার মাটির কথা মানুষের কথা। কাশী থেকে দেশে এসে রাজনের কাছ থেকে ঠাকুরঝির মৃত্যুর সংবাদ পায়— ঠাকুরঝি পাগল হয়ে মারা যায়। নিতাই একেবারে একা, একেবারে নিঃসঙ্গ ঠিক এরকম— 'ধুধু করা দুপুরে জ্বলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা যেমন সঙ্গীহীন তেমনি।'"[১১] তাই নিতাই মায়ের দরবারে মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে চায়— 'জীবন এত ছোট কেনে?'

ঠাকুরঝি রাজনের বউ এর বোন রাজনের শালিকা পরস্ত্রী কিন্তু ধীরে ধীরে কবি নিতাইয়ের মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। নিতাই নিজেকে প্রশ্ন করেছে— "এই মেয়েটি তাহার কে?' আবার নিজেই উত্তর দিয়েছে কে আবার 'মনের মানুষ'। তাই মনের মানুষকে দেখার জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং গুনগুন করে গান ধরে—

"ও আমার মনের মানুষ গো
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর।
ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
আমার হেথা টানে নিরন্তর।"

ঠাকুরঝি নিতাইয়ের প্রেরণাদাত্রী কবি সত্তার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই নিতাইয়ের কবিয়াল হওয়ার সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের কাছে নিজের জাতির কাছে কবি রূপে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সমাজের লোকজন মা-মামা সকলে নিতাইকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছে। নিতাই সব ছেড়ে একা হয়ে রাজনের কাছে এলে তার জীবনে মূল আকর্ষণ

কোথায় যায়? সে তো আর ফিরে আসে না যার যায় সেই মানুষটির দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা তুষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে যেন 'রাবণের চিতা' এর শেষ নেই। প্রায় সব সমাজে সব ধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস করতে চায় এই কামনা থেকেই জন্ম নেয় আত্মার কল্পনা, যে আত্মা অমর-দার্শনিকদের কাছে যা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। 'কবি' উপন্যাসে যে মৃত্যুর দর্শন আছে তা পরবর্তীকালে 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯) উপন্যাসেও বর্তমান। মানুষের মধ্যে যে মৃত্যু জিজ্ঞাসা আছে, মৃত্যুর দর্শন সম্বন্ধে যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা আছে, মৃত্যুর রহস্যময়তার সম্বন্ধে যে অনুভূতি তা নিতান্তই কবিয়াল ও জীবন মশাই-এর দৃষ্টিতে বর্তমান।

নিতাইয়ের গান— 'জীবন এত ছোট কেনে?' বসন্তকে ভাবায়। বসন্তের অহরহ মৃত্যু ভাবনা। তাই যে নিতাইকে বলে 'মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার উপর এই গান তোমার মনে এসেছে। কি করে এলো?' বসন্তের মনের কথা হয়ে ওঠে দৈববাণীর মতো সত্য। বসন্তের জ্বর হয়। এই অবস্থায় সে নিতাইকে হেসে বলে— "হায় জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে কবিয়াল।" ১৯তম অধ্যায়ের মৃত্যুর দৃশ্য আছে। নিজের মৃত্যু নিয়ে কেউ চিন্তা করে না কিন্তু যারা তার নিজস্ব বা প্রিয়জন তাদের মৃত্যু কত দুঃসহ কত ভয়ংকর। প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে যে বেঁচে থাকে তার 'মরণের অধিক মরণ যন্ত্রণা' হয়। বাঁচার আশা প্রতিটি মানুষের দীর্ঘদিনের। কিন্তু বাঁচা কি হয়ে ওঠে? তবুও আশাবাদী মানুষ বলতে চায়—

"তবুও মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জীবনের স্রোত ভালোবাসে
গলিত স্থবীর ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।"[১০]

মৃত্যুরে কে মনে রাখে? কিন্তু দেখা যাচ্ছে মৃত্যুচৈতন্য সব সময় জাগরুক। বিশ্ব জগতে প্রতিনিয়ত রূপ থেকে অরূপে আর অরূপ থেকে রূপে প্রত্যাবর্তনে চাকা ঘুরছে। প্রাণ চৈতন্য সম্পন্ন দেহ এমনিতর একটি রূপ, মৃত্যু সেই বিশিষ্ট রূপ থেকে অরূপের দিকে ফিরে যাওয়া। পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন নয়, আর এ জীবনওতো মরণের সমষ্টি ছাড়াও অন্য কিছু নয়, প্রতিক্ষণে কত পরিবর্তন ঘটে এই দেহের অন্তরালে ঠাকুরঝি, বসন্ত এইরকমই মানুষ। এদের শৈশবের, পরে যৌবন, যৌবনের পরে বার্ধক্য, এবং বার্ধক্যের পর দেহান্তর— এ যেন শৃঙ্খল পরম্পরা। আশাবাদী বসন্ত বাঁচার আকুলতায় নিতাই কবিয়ালকে বলেছে ১৯ অধ্যায়ে—

"গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না।" (পৃ. ১২৪)

কিন্তু মরণ অবশ্যই জীবনে আসবে এতো তারই লীলা নিয়তি, কেউ কেউ আগে কেউ পরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে বলেছেন— 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' অসুস্থ বসন্তের সেবা নিতাই করেছে। সেদিন জ্বর ঘাম দিয়ে ছাড়েনি। অস্থিরতা বসন্তের আজ অতিরিক্ত। নিতাই সে রাতের বসনের দৃষ্টি অর্থ বুঝেছিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলছে— 'আমি আছি। এই আমি।' 'শেষরাতে নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল 'মনসামঙ্গল'-এর কাব্যের বেহুলার মতো। বেহুলাও ঘুমিয়েছিল শেষ রাতে আর তখনই লখিন্দরের সর্প দংশন। রাতে শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপে নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়ে একটা রহস্যময় শীতলতা ধীরে

ঝুমুর দল স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। ঠাকুরঝি নিতাই ও বসনের ঘরের দৃশ্য দেখে নিতাইয়ের জীবন থেকে সরে যেতে চায়, অসুস্থ হয়। ঠাকুরঝি আর আসে না— "একদিন, দুই দিন, তিন দিন— ওঝার মন্ত্রপুত ঝাঁটার প্রহারে ঠাকুরঝি নিতাই কবিয়ালের নাম করেছে। রাজনের স্ত্রী নিতাইকে দোষারোপ করে বলে— 'তুই, তুই, তুই, তোর নজর এই কচি মেয়েটির আজ এই অবস্থা। এত লোভ তোর? তোর মনে এত পাপ।" উদাসীন স্তব্ধ নিতাই এ লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। ঠিক সেই দিনই ঝুমুর দলের বেহালাদার নিতায়ের কাছে এসে বলে— "বসন পাঠালে।" নিতাই ঝুমুর দলে যোগদান করতে চায়। ঠাকুরঝির ঘর ভাঙতে চায়নি। সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠে। কিন্তু মনে পড়ে থাকে ঠাকুরঝির কাছে, রাজনের কাছে, সেখানকার সকলের কাছে। এ প্রসঙ্গে মনীন্দ্র রায়ের 'চিঠি' কবিতার সরলার মায়ের ভাবনাটি অনেকটা নিতাইয়ের ভাবনার মতই—

"পূর্ব দুয়ারী ঘর, সিঁদুরে রাঙা আম,
রসূল করিমের ব্যাটা মাঝিপাড়ার আমিনা।
তারও কথা কিছুতেই ভুলতে যে পারি না।"

আলেপুলের মেলায় ঝুমুরের দলে নিতাইয়ের তাত্ত্বিক গানে বসন্তের দল হেরে যায়। নিতাইয়ের গানে যৌনতা নেই যা ঝুমুরের দলের প্রাণ। যেদিন বসন্ত নিতাইকে চড় মারে সেই দিনই আঘাতপ্রাপ্ত নিতাই প্রচুর মদ খেয়ে অশ্লীল যৌনতায় ভরা গান ধরে। মদের স্পর্শে নিতাইয়ের— "কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের বীজানু গুলো অধীর চঞ্চলতায় জেগে ওঠে।" এভাবেই অশ্লীল গান গেয়ে নিতাই বসন সহ সকলের মন জয় করে। আবার সে বসনের প্রেমে আসক্ত হয়, গাঁটছাড়া বাঁধে। বসন অসুস্থ হলে সেবা করে বসনও মনের মানুষ পায় নিতাই সেদিন গান বাঁধে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটলো না আশ-কুলালো না এ জীবনে।
হায় জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

অসুস্থ বসন মারা গেলে নিতাই সৎকার করে। রাতে বসন্তের চিতার পাশে যায়, চোখ বন্ধ করলেই সত্যিকারের বসন্ত উপস্থিত হয় তার সামনে। নিতাই ভাবে— "যে যায় সে কোথায় যায় সে তো আর ফিরে আসে না।" বসন কে ছেড়ে ঝুমুর দল ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। আজ বসন্ত চলে যাবার পর সে ঝুমুর দল ত্যাগ করে। ছুটি পায় এবং দেশান্তরী পুনরায় গমন করতে চায়। ভগবানের শ্রীচরণে বসে গান রচনা করবে বলে কাশী যাত্রা করে। নিতাই নিসঙ্গ হয়।

'কবি' উপন্যাস-মৃত্যুচিন্তা

'জন্মিলে মরিতে হবে' এ কথা আমাদের সকলের জানা। প্রাণী মাত্রই মৃত্যু অনিবার্য হলেও আমরা সহজে আমাদের প্রিয়জনের, প্রিয় প্রাণীর মৃত্যু মেনে নিতে পারিনা। যে যায় যে সে

নয় হেথা নয় অন্য কোথা' এই কামনায় বিভোর থাকে। এই দ্বিতীয় দলে পড়ে নিতাই। সে কবি হতে চেয়েছে। সে ঠাকুরঝিকে, মনের মানুষকে নিজের করে পেতে চেয়েছে, ঠাকুরঝিও। তাই তো যেদিন নিতাই পয়সার অভাবে দুধ নিতে পারবে না বলেছিল সেদিন পয়সা ছাড়াই তাকে দুধ দিতে রাজি হয় এবং 'অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুটি ছাপিয়া ধরিল।" এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে পরস্পর পরস্পরকে কতটা ভালবাসে। নিতাই ঠাকুরঝিকে ভালোবাসে বুঝেছে— 'ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে।" এ যেন রবীন্দ্র কথিত কথা—

"মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু ঠাঁই
বিরহে টুটিয়া বাঁধা আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

অর্থাৎ নিতাই ঠাকুরঝিকে 'তিল আধ পাসরিতে' পারে না। সুতরাং ঠাকুরঝি নিতাইয়ের জীবনে না এলে নিতাইয়ের কবি হয়ে ওঠা হয় না। নিতাই-এর কথায়— "ওগো, ঠাকুরঝি! কি মহাভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে...।" তাই তো বোঝা যায় নিতাইয়ের জীবনে ঠাকুরঝি কতোটা? কিন্তু ভালোবেসেও পিছুপা হয়েছে, কারণ ঠাকুরঝির ঘর ভাঙবে, লোকে কি বলবে? ঠাকুরঝিকে নিয়ে দেশান্তরী হলেও লোকে ঘৃণা করবে, ছি: ছি: করবে। তাই নিতাই ভাবে ঠাকুরঝি তার জীবনের চাঁদ। গান বাঁধে—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাকো আমি তোমায় দেখবো খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনা কো হে সোনার রঙে লাগবে কালি।"

নিতাই মনের আগুনে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে। সে ঠাকুরঝির ঘর ভাঙতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে অভাগা নিতাই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান মনে করে—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি
বলতে কথা বুকে ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

নিতাই মনের টানাপোড়েনে স্তব্ধ হয়ে বসে শান্ত হয়। অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষে উপন্যাসে প্রবেশ ঝুমুর দলের নায়িকা দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে বসন্তের যে নিতাইকে 'কালোমানিক' বলে। বসন্তকে "সিক্ত বাসের স্বচ্ছতার আড়ালে আহার সুপরিস্ফুট সর্বাঙ্গ" দেখে নিতাই লজ্জিত হয়। মেয়েটার ঠোঁটের কোন দুইটা যেন গুন দেওয়া ধনুকের মতো। এই বসন্ত নিতাইয়ের ঘরে আসে। বিছানায় আরামে শুয়ে থাকে এবং নিতাই ঘরে এলে বলে তার মাথা টিপে দিতে, নিতাইও মাথা টিপে দেয়। এই দৃশ্য নিতাইয়ের মনের মানুষ ঠাকুরঝিও দেখেছে এবং 'দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মতো চলিয়াছে। মাথার কেবল স্বর্ণ বিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি।" বিপুল জ্যোৎস্নাময়তার মধ্যে ঠাকুরঝির হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের সব শেষ হয়ে যায় এগারো অধ্যায়ের প্রথমেই। লেখক তারাশঙ্কর আবার বলেন— "ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাইনা খেলেন। এক ঘাটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্য দেখেন। ঠাকুরঝির বসন্তকে দেখিয়া চালিয়ে গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চালিয়ে গেলে।" এ যে ভগবানের এক অদ্ভুত পরিহাস।'

"আমি ভালো বেশে এই বঝেছি সুখের সার সে চোখের জলেরে।
তুমি হাসাও আমি কাঁদি বাঁশি বাজুক কদমতলেরে।"

নিতাই ক্রমশ ঠাকুরঝির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে মহাদেবের সৌজন্যে গান গাইতে গিয়ে পাঁচ দিন পরে ফিরে আসে। টাকা পায়। সেই টাকায় জুতো চাদর কেনে চাঁদের না হলে কবিয়াল কে মানায় না। ঠাকুরঝির জন্য বা ভালোবাসায় মানুষের জন্য সুতার মতই সোনার মতো মিহি ঝকঝকে একগাছি সুতাহার কিনে এনেছিল এবং ঠাকুরঝিকে চোখ বুঝতে বলে তার গলায় সেটি পড়িয়ে দেয়। ঠাকুরঝির বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবশ ও নির্বাক হয়ে যায়। এই হার খানি সোনার না হলেও সেটি ঠাকুরঝির কাছে সোনার চেয়েও দামি কারণ প্রেমাস্পদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার— "হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভেতরটা তার থরথর করে কাঁপছে বসন্ত দিনে দুপুরে বাতাসে অশ্বত্থ গাছের কচি পাতার মত।' ঠাকুরঝিকে রাজন কালো বলায় ঠাকুরঝি রাগ করে কিন্তু নিতাই গান বাঁধে—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদে কেনে
কাল কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

ঠাকুরঝির সংসারে থাকা সত্ত্বেও নিতাইয়ের কবিত্ব গুণকে ভালোবেসে, নিতাইকে ভালোবাসে। আবার নিতাইও ধীরে ধীরে ঠাকুরঝির প্রতি আসক্ত হয়। নিতাইয়ের মন চঞ্চল হয়। নিতাইয়ের এই মনকে চিত্ররূপময় করে তুলেছেন লেখক তারাশঙ্কর এভাবে— "ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে দিকচক্রবাল ধুলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস উতলা হয়েছে। সেই উতলা বাতাস ধূলা উড়াইয়া বহিয়া যায়। যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত।" নিতাইয়ের গান শুনে সৃষ্টি ধর অবলুপ্ত হয়। কি এমন সেই গান— এই গান হল খাঁটি গান—

"আহা ভালোবেসে এই বুঝেছি/সুখের সার সে চোখের জলেরে... আমায় ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণ পূজা/ তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকের পিদিম জ্বালেরে।'
এ গান শুনেই সৃষ্টিধর বলেছিলেন— 'হবে তোর হবেই'। এসব গান চিত্ররূপময় বর্ণনা অনেকটা 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[৮]

নিতাইয়ের গানগুলো প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন— "আমি সেসময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম।... অনেক লাইন বেঁধেছি ... অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি ও নিতাই এর রচনা হয়নি।"[৯]

নিতাইয়ের মনে একসময় প্রশ্ন জাগলো— 'কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ও মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল— কে আবার 'মনের মানুষ'। 'মনের মানুষের' জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে।' এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে নিতাই গুনগুন করে ধ্বনি তোলে—

'ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!"

পৃথিবীতে মানুষ স্বপ্ন দেখে দুরকম— এক. রাতে ঘুমিয়ে, দুই. জেগে। যারা জেগে স্বপ্ন দেখে তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে, ক্লান্ত হয় স্বপ্নকে সার্থকভাবে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষায়—'হেথা

কিন্তু নিতাইয়ের এই গান কবির আসরে বন্ধু রাজা, রাজার বউ, রাজার শালিকাকে আপ্লুত করে, এরা অবাক হয়। রাজা একবার ফিরে স্ত্রী ও ঠাকুরঝি-র দিকে তাকিয়ে হাসে অর্থাৎ 'দেখো' স্ত্রী বিস্ময়ের মুগ্ধ— 'হাসিয়া হাসিয়া বলিল— তা বটে বাপু।' রাজার শালিকা বিস্ময়ে হতবাক, লেখকের কথায়— 'ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়েছে— দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।' ওদিকে কবির আসরে উপস্থিত বাবুদের মহলেও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কলকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুটি স্বীকার করে বললেন— 'yes। এ রীতিমত একটি বিষয়! son of Dom অ্যা!- He is a poet!' নিতাই এই বাবুটির কথায় অর্থ বুঝতে না পেরে বিনীত স্বপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে— "আজ্ঞে': তখন বাবু বললেন— 'তুমি তো একজন কবিরে।' আপ্লুত নিতাই হাতজোড় করে তখন বলিলেন যে তার বংশের পেশা কোনটাই সে করে না চুরি করে না, মিছে কথা বলে না, নেশ করে না। এছাড়াও বলেছে— জাত-জ্ঞাতি, মা-ভাইয়ের সঙ্গেও এজন্য বনেনা আমার। ঘর তো ঘর আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাগ করেছি এরকম। আমি থাকি স্টেশনে রাজন পয়েটসমেন এর কাছে। কুলিগিরি করে খাই।" সে অঞ্চলের সমস্ত কিছু নখদর্পণে ভূতনাথের। সে নিতাইকে সমর্থন করে বলল—'হাজারোবার! সাচ্ছা সাধু সাচ্ছা আদমি নিতাই।'

এই নিতাইকে তার বংশের লোকেরা অর্থাৎ বীরবংশীরা ঘৃণা করে এবং চৌর্যবৃত্তি বিমুখতার জন্য তারা তার মধ্যে আবিষ্কার করে 'একটি ভীরুতাকে'! এই ভীরু নিতাইকে বীরবংশীরা সহ্য করতে পারে না। সেজন্যই নিতাইকে যেদিন মহাদেব কবিয়াল বংশ ধরে অশ্লীল ভাষায় গাল দেয় সে কথা তার মামা গৌড়চরণ হাত থেকে সেদিন রেহাই পায়। স্টেশনের পরিচিত জন নিতাইয়ের গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে। ঠাকুরঝির ও মুগ্ধ হয়। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঠাকুরঝিকে দেখেছিল— "তাহার সর্বাঙ্গে; কচি পাতার মত একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল 'ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না।" রাজন নিতাইকে মদ খাওয়ার কথা বলায় নিতাই হাত জোড় করে বলেছিলেন— "মাপ করো ভাই রাজন। ও দ্রব্য আমি ছুঁই না।" এই কথা শুনে ঠাকুরঝি বলেছিলেন— "দুধ খাবা দুধ?" ঘটনা ক্রমে জীবনে ঠাকুরঝির প্রবেশ ঘটে। ঠাকুরঝি রোজ এক পোয়া করে দুধ দেয়। ধীরে ধীরে নিতাই ঠাকুরঝি প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে আর পাঁচটা রক্তে মাংসের মানুষের মত। ঠাকুরঝির আসা-যাওয়া সে নিবিষ্ঠ চিত্তে নজরে রাখে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এভাবে— "সেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়েছে সেখানে দৃষ্টি অবাক করিয়া দাঁড়ায়। সহসা যে সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মতো রেখা দেখা যায়। রেখাটি মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবর্ণ বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাঁচা মোটা সুতার খাটো কাপড় খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা সে একটি কাল দীর্ঘাঙ্গি মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তকতকে মাজা সোনার পিতলের ঘটি। ঘটিটি ধরেনা এক হাত মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে সে দ্রুত পদে আবলিলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে। কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।"

যেদিন নিতাই এর মামা নিতাইকে আক্রমণ করে, হেনস্থা করে— ঠাকুরঝি ভয় পেয়ে যায়। ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। এই পরিস্থিতিতে নিতাই গান বাঁধে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে—

প্রেমিক-প্রেমিকার রাগ বিরহ মিলনের কথা ও চিত্রের আভাস আছে।"[৭] তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিশেষ করে 'কবি' উপন্যাসে এক জাতীয় প্রেম আছে যা অপ্রাপ্তির বেদনায় নায়ক নায়িকার সঙ্গে পাঠককেও আহত। করে এ প্রেম চলিতে ও চালাতে পারলে আমাদের হৃদমাঝারে ভরে উঠত পুলকে, বাস্তববোধ সম্পৃক্ত এবং নিরাসক্ত ঐদাসীন্য; যা তারাশঙ্করের মনের ধর্ম, তিনি দ্রস্টার ভূমিকায় লেখককে নিয়ে গেছেন। এই আশাহত প্রেমের দৃষ্টান্ত 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল। যে নিতাই একটি নিম্ন বংশের সন্তান— "যে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস... ঘুনির দৌহিত্র; ডাকাতের ভাগিনের ঠাঙারের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র— নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।" পূর্বপুরুষের পরম্পরাগত পেশা ও সকলকে ছেড়ে নিতাই ভালোমানুষ হবার স্বপ্ন দেখে ঘর ছাড়ে, গ্রাম ছাড়ে, মা-মামাকে ত্যাগ করে সে চলে আসে তার স্বপ্ন সার্থক করতে। নিতাইয়ের মামা গৌড়চরণ কুলাধিপতি। তাদের সজনদের নৈশাভিযানের দলপতি— নিতাইয়ের এইসব ছেড়ে চলে আসা মেনে নেয়নি। নিতাইকে মহাদেব তাদের জাত নিয়ে কবির আসরে বলে—

'সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইলো!
ও ব্যাটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর বর্তাবাবা ঠেঙ্গারে
মাতামহ ডাকাত ব্যাটার দ্বীপান্তরে মরে!
সেই বংশের ছেলে ব্যাটা কবি তুই'

মহাদেব কবিয়ালের দোয়ারেরা নতুন ধুয়া গায় আর অপমান করে—

"আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগগে যাবার আশা-গো
ফরাত করে উড়লো পাতা স্বগগে যাবার আশা-গো।"

এভাবেই একের পর মহাদেব ও তার দোয়ারেরা নিতাইকে নানাভাবে অপমান জনক ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে রাত যত বাড়তে থাকে মহাদেবের তাণ্ডব আরো বাড়ে মহাদেব ভয়ংকর হয়। নিতাইকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু নিতাই ভেঙে পড়েনি মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবির আসরে জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়; তবে "আঘাতই সৃষ্টি'এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে হাসিমুখে সব গালিগালির উত্তরে নিতাই ছড়া কেটে বলল—

"ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।
তোমার হয়েছে ভিমরতি— আমাকে কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব— কোনই ভয় করিনা মনে।"

সাধারণ শ্রোতার অশ্লীল সোনায় অভ্যস্ত, তাই নিতাইয়ের এই কবিগান ভালো লাগবে না, লাগেনা। নিতাইয়ের তাত্ত্বিক গান এরূপ—

"ক-য়ে কালী কপালিনী খ-য়ে খপুর ধারিনী—
গ-য়ে গোমাতা সুরভি-গণেশ জননী-কণ্ঠ দাও মা বাণী।"

ভেবেছে এরকম গান বাঁধতে হবে যাতে নিধুবাবুর মত লোক তাকেও মনে রাখে। বসনের মৃত্যুর পর সে ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে কিন্তু ঠাকুরঝির কথা মনে হওয়ায় সে চলে যায় কাশীতে। সেখানে যে বিধবা মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয় তিনি বলেছিলেন— 'এতো বাংলাদেশের মাটি নয়। বাবা তুমি দেশে চলে যাও। সেখানে তোমার গানের কদর হবে।" বাস্তবিক কবি সেখানেই কবিতা লিখতে পারেন, যেখানে তাঁর কবিতার ভাষার মানুষ বুঝতে পারে, তাই শেষ পর্যন্ত বাড়ির দিকে যাত্রা হয়। দেশান্তরী নিতাই যেন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমির 'উপেন'। দেশ দেশান্তরে ঘুরেও তার তৃপ্তি মিটে না। ফিরে আসে দেশের পথে। বর্ধমানের লুপ লাইনের ট্রেন। নিতাই গান গায়—

"সাড়া দেমা-দেমা সাড়া
ঘর পালানো ছেলে এল-বেরিয়ে বিদেশ বিভূঁই পাড়া।"

নিতাই যেন নিজের কাছে নিজেই সান্ত্বনা চায়। মোহিতলাল মজুমদার লিখছেন— "একাহিনীর নায়ক কবি হইলেও স্বভাব কবি, শিল্পী কবি নয়-মানস কবি, ... উহার ঐ কবি শক্তি প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি বা প্রেম শক্তিরই অপর নাম।"[৪] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে "নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকারের কবির মতো স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী। জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তাহার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে গীতি অনুগণে রূপান্তরিত হয়। তাহার মনের এই দ্রুত, অবাধ সংবেদন স্থূলতা ও উদাস উদার নির্লিপ্ততা তাহাকে প্রকৃত কবিতর গোত্রীয় করিয়াছে।"[৫] বাস্তবিক লেখক নিতাইকে কবিওয়ালাদের অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রেখে ভক্তি নিষ্ঠা ও রুচির সূক্ষ্মতায় যথার্থ কবির পূর্ণতা দিয়েছেন। যদিও বসনের ও ঝুমুরদলের প্রভাবে তার কবি পথের সাময়িক বিচ্যুতি ঘটেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাখি যেমন প্রভাতের আলোকে ভালোবেসে, ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের সেরকম ভালোবাসা তাকে একজন লোককবির অভিধা দিয়েছে।

রাঢ়বঙ্গের মাটির গন্ধ কবি: চরণ কবি তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর রাঢ়ের চারণ কবি— এর মধ্যে প্রশংসা নিন্দা যা থাকে তিনি যে জীবন দেখেছেন দিনের পর দিন যে মানুষগুলোকে শিশু থেকে অমৃত্যু চেয়ে ভেবে দেখেছেন তাদেরই চিত্ররূপ দিয়েছেন। যারা রক্তে মাংসে রাঢ় বাংলার মাটির মানুষ। তাইতো লেখক বলেছেন— "আমার বই বলুন আর যাই বলুন সেটা হচ্ছে রাঢ় দেশ। এর ভিতর থেকেই আমার যা কিছু পাওয়া। এখানকার মানুষ এখানকার জীবন নিয়ে লিখছি। তার বেশী আমার আর কিছু নেই।"[৬] তিনি দেখিয়েছেন রাতে জনশ্রুতি কিংবদন্তি, বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, কুসংস্কার ধর্ম এর আর্থ-সামাজিক ক্রমবিবর্তন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে লেখক এর ব্যক্তিসত্তা দেশ কাল ও সমাজের মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-বিরহ-মৃত্যু কবি উপন্যাসেও-এর প্রভাব রয়েছে অনেক স্থানে।

নায়ক নিতাই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণ নিঃসঙ্গতায়

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্রা আছে, কিন্তু প্রেমচিত্র অঙ্কনে তিনি মনোনিবেশ এবং সময় ব্যয়ে তিনি কার্পণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর কথায়—"আমার সাহিত্যে নব দম্পতি বা

এর পরেই আসে ঝুমুর দলের ডাক। পরে জোর করেই সে বসনের ভালোবাসার টানে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বসন নাচে নিতাই গান গায়। আসরে বসনের দলের পাওনা টাকা কম পড়ায় আসর ভালো জমেনি বলে বসন চর মারে নিতাইকে, এই চড় নিতাইয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একদিকে তারণ মণ্ডলের আদর্শে কবি হওয়ার পথ কন্টাকিত হয়ে ওঠে তার গান খিস্তি খেউর সমন্বিত নীচ রুচির গানের ভেতর দিয়ে। এখানেই ঘাঁটছাড়া বাঁধে নিতাই বসনের সঙ্গে। বহুদিন ঝুমুর দল ছাড়ার চেষ্টা করেও সে পারেনি বসন এর জন্য। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নিতাইয়ের জীবন থেকে বসন বিদায় নেয়, নিতাই বুঝতে পারে জীবনের সীমাবদ্ধতা ভালোবাসার অতৃপ্তি থেকে যায় জীবনে তাই সে গান গায়—

"হায় জীবন এত ছোট কেনে
এ ভুবনে?"

নিতাইয়ের জীবনে বসন্ত এভাবেই পরিবর্তন আনে। বসন চরিত্রে আছে তীক্ষ্ণ হিংস্র প্রবৃত্তির উদ্দামতা বেপরোয়া জীবন উপভোগের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা বন্ধনহীনতার আনন্দ। আর সেই সঙ্গে নৈরাশ্য, হতাশা, আত্মগ্লানি। বসন জানে পৃথিবীতে তার আয়ু আর বেশিদিন নয়। পুরনো কাশের অন্তিমপরিণতি গণিকা বৃত্তির পঙ্কে নিমজ্জিত বসন যেন মলিন কিট কাটা পঙ্কজ। বসন যেন শার্ল বোদলেয়ার কথিত 'আসিব-পুষ্প'। বসন্ত মারা যাবার পরেই নিতাইয়ের জীবনে ঘটে পালাবদল, তখন সে গান গেয়েছে—

"মরণ তোমার হার হলো যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।"

এভাবেই তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলায় মাসী না করলে নিতাই বলে— "না মাসি খেলার এক পালা শেষ হলো। এবার নতুন পালা। এবার পথের পালা। এবার পথে পথে।"

আসলে লেখক নিতাইকে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত অভিজ্ঞতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সীমা থেকে অসীমের দিকে নিতে চেয়েছেন তাই প্রকৃতি প্রেম, স্বদেশ প্রেম, নারী প্রেম, জীবন প্রেমের সম্বন্ধে নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে কবি জীবন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ওয়ালা' শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে কবির জাত গেছে। 'কবি' আর 'কবিওয়ালা' সমার্থক নয়। 'কবিওয়ালা' বলতে প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর গ্রাম্য কবিদের ভ্রাম্যমান জীবনের কবি গানের লড়াই-এর প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা যায়। সেই তাৎক্ষণিক কবিতাগুলোতে কোন বিরোধ নেই— আছে অশ্লীলতা, স্থূলতা, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ এবং মূর্খ অশিক্ষিত গ্রাম্য শ্রোতাদের হাততালি পাওয়ার বাসনা।

কিন্তু নিতাইকে তারাশঙ্কর কবিওয়ালাদের প্রচলিত ছকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। ঝুমুর দলের মাসির মুখে বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালী শুনে নিতাই বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, দাশু রায়ের পাঁচালী সংগ্রহ করে তার ভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছে। বসন তাকে টপ্পা গানও শিখিয়েছে। বসন এর মুখে নিধুবাবুর টপ্পা গান শুনে নিতাই পদাবলীর সঙ্গে প্রভেদ বুঝতে শিখেছে এবং

"আমার মনের মানুষ গো তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর।"

অথবা,

"চাঁদ তুমি আকাশে থাকো আমি তোমায় দেখবো খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে-সোনার অঙ্গে লাগবে কালী।"

নিতাইকে লেখক দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলেছেন, কুখ্যাত অপরাধ প্রবণ ডোম বংশে জাত নিতাই ঘটনাচক্রে একদিন কবিরূপে সমাজ সমক্ষে আত্মপ্রকাশন করে। এ ঘটনা সমাজের বা সাধারণের কাছে আকস্মিক মনে হলেও তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কবিত্বের প্রেরণা না বা শিল্পী: প্রেরণা একটা regional impression 'poet of is in deed something divine' বলেছেন উনিশ শতকের রোমান্টিক কবি শেলী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'দৈববাণী'। অগ্নিপুরাণে আছে— 'আপারে কাব্য সংসারে কবিরেক প্রজাতিক।' তাই নিতাই তুচ্ছ উপেক্ষিত বীরবংশীয় হয়েও অন্তরের শৈল্পিক প্রেরণায় হঠাৎ একদিন কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য প্রস্তাবিত পর্ব আগেই ছিল এবং সুযোগও একদিন হয়ে গেল। অট্টহাস গ্রামে মহাপীঠ চামুণ্ডার মেলায় কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল এলেও নোটন দাস বাড়তি পয়সার লোভে পালিয়ে যায় এবং নিতাই দোয়ারকি করতে নেমে কবিগানের আসরে মেতে ওঠে কবির লড়াইয়ে।

নিতাইয়ের সঙ্গে মহাদেবের যে কবির লড়াই হয় সেখানে নিতাই ভদ্র বিনীত এবং শিষ্টাচার প্রিয়। অন্যদিকে মহাদেব কবিয়াল তাকে ছাড়া কেটে আহত করে, জাত তুলে গালি দেয়। এক অভিনব হিনমন্যতা জাতিবর্ণভেদদুষ্ট সাধারণ দর্শকদেরও আনন্দ দেয়—

"আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা স্বগগে যাবার আশাগো'
ফরাত করে উড়ল পাতা স্বর্গগে যাবার আশাগো।"

এতেও নিতাই অপ্রতিভ না হয়ে তাঁর শিষ্টাচার বজায় রাখে। ফলে সাধারণের কাছে তাকে নিষ্প্রভ মনে হলেও যেদিন সে কবির আসরে গেয়েছিলেন—

"এই খেদ মোর মনে মনে
ভালোবেসে মিটলো না আশ কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট কেনে?
এই ভুবনে?"

তখন সাধারণ শ্রোতা-দর্শক বারবার প্রশ্ন করেছিল তার গানের যে— কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?' প্রতিদিনের পরিচিত মানুষটির মধ্যে এক ভিন্ন প্রতিভার স্ফুরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ঠাকুরঝি বিস্মিত হয়েছিল সমস্ত দর্শক শ্রোতা'। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদ রেল স্টেশনে নেমে ছিল ঝুমুর দল। কবি গানের সূত্র ধরেই সামান্য সময়ের মধ্যেই ঝুমুর দলের পটীয়সী বারাঙ্গনা বসনের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয় নিতাইয়ের। এই দিন রাতে বসনকে নিতাইয়ের ঘরে দেখে ঠাকুরঝির এতদিনের তিলতিল করে গড়ে তোলা ভালোবাসার মন্দিরের গায়ে আঘাত লাগে, এই আঘাত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিতাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কে সব মধুরতা। অনেক দূরে যেখানে রেল লাইন দুটি এক হয়ে একটি রেখায় মিশে গেছে, যেখানে প্রতিদিনের স্বর্ণ বিন্দু থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠা ঠাকুরঝিকে আর দেখা যায় না। নিতাইয়ের হৃদয়ের সমস্ত ভাবনা প্রবাহ উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

নিতাইয়ের পটভূমি। এরা দুজনে নিতাই-এর কাছে জীবনের দুই রূপের সন্ধান দিয়েছে। ঠাকুরঝি ও বসন যেন দুটি পাখি একজন খাঁচার শিকে মাথা খুঁটে নিঃশেষে, অন্য জন উড়ে উড়ে নীড় খুঁজে পেল না।'[৬] কবির মূলকথা নিতাইয়ের আত্ম আবিষ্কার, ডোম জীবনের অন্ধকার পট, বসনের মাসির জীবনের ডোরাকাটা জীবন— এরই মাঝখান দিয়ে নিতাইকে চলতে হয়েছে নিজেকে।

কবিয়ালের প্রেরণাময়ী

ডোম বংশের ছেলে নিতাইকে উপন্যাসের প্রথম থেকেই দেখা যায় পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে। জমিদারের মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামে যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন হয় তাতে সে সব থেকে কৃতি এবং একমাত্র ছাত্র। তার জীবনের আদর্শ ছিল তারিণী মণ্ডল। সে স্বপ্ন দেখতো তারণ মণ্ডলের মত কবি হওয়ার। আর গোটা উপন্যাস ধরে লেখক আমাদের কাছে নিতাইয়ের কবি হওয়ার কাহিনি তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই পাওয়া যায়, "শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনা নয়, রীতিমতো একটা সংগঠন, চোর-ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।" অবশ্য এর নজির পাওয়া যায় রত্নাকর দস্যুর বা বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হওয়া, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম-এই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে ডোম বংশের ছেলে নিতাইয়ের কবি হওয়া কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। একদিকে অলৌকিকতা অন্যদিকে অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন নিতাইকে সত্যই 'কবি' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পূর্বপুরুষদের মত চুরি ডাকাতি, দস্যু বৃত্তির মতো পোশাকে সে অন্যায় ও অপরাধ মূলক তিরস্কৃত হয়েছে। এই অবহেলা এবং তিরস্কার নিতাইকে অন্য মানুষ হতে ইন্ধন যুগিয়েছে, যে সমাজ বাড়ি থেকে পথে ভেসেছে, আশ্রয় নিয়েছে রেলস্টেশনে তার পরম বন্ধু রাজালাল বায়েনের কাছে।

রাজালাল নিতাইয়ের যথার্থই বন্ধু। নিতাইয়ের সংগ্রহের পুথিগুলি তার একমাত্র সম্বল। রাজন প্রতিমুহূর্তে নিতাইকে প্রেরণা যোগাত। আর নিতাই তার স্বপ্নের কথা বলত রাজনকে। দুধ বিক্রয় সূত্রে নিতাই-এর জীবনের প্রথম প্রেরণাদাত্রী ঠাকুরঝির আবির্ভাব। স্বচ্ছল সংসারের সুখী গৃহিনী ঠাকুরঝির জীবনে নিতাইয়ের অন্তরঙ্গতা এবং ভালোবাসা দুষ্টু গ্রহের মতো। যার প্রভাবে শিথিল হয়েছে ঠাকুরঝির সাংসারিক বন্ধন, অন্যদিকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির সম্পর্ক এর ফলে নিতাইয়ের কণ্ঠে বেজে উঠেছে অজস্র ভালোবাসার গান। এই অন্তরঙ্গতার পথেই নিতাই-এর কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ভাবে বেজে উঠেছে অজস্র ভালোবাসার গান। রাজন একদিকে ঠাকুর অন্য দিকে কালো বলে ব্যঙ্গ করলে সেই বেদনার নিতাইয়ের বুকেও সমান ভাবে আঘাত করেছিল। আর তখনই নিতাই কণ্ঠে বেজে উঠেছিল—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কাল কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাই জানে ঠাকুরঝির সঙ্গে তার মিলন সম্ভব নয়। তাই সে রাজনের দেওয়া প্রস্তাব অর্থাৎ ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার প্রস্তাব সে নৈতিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। আর এই অপ্রাপ্তির বেদনা থেকেই সে গেয়েছে—

এভাবেই তাদের জীবনযাত্রা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে। তবে নিতাই-এর দপ্তর বড় হয়ে ওঠে, সে কলকাতা থেকে বই আনায়। বসনের কাছেও সে গান শেখার কথা বলে। বসন-এর আগে ছিল মনের মানুষহীন। তাই নিতাই অন্য মেয়েদের কাছে হয়ে ওঠে বসন্তের কোকিল। বসন্ত নিতাইকে টপ্পা গান শেখায়—

"ভালোবাসি বলে ভালোবাসিনে/আমার স্বভাব এই তোমারই আব জানিনে।"

বসনের গোপন অসুখ চাপা থাকে না। সে মারা যায়। নিতাই সমস্ত বন্ধন হারিয়ে ঝুমুর দলের উদাসীন নিষ্ঠুরতা দেখে আর সে থাকতে চায় না, তাই সে গান গেয়েছে—

"ভালোবেসে মিটলো না আশ/ কুললো না এ জীবনে।"

হায় জীবন এত ছোট কেনে?/এই ভুবনে?"

দলের মাসী তাকে দলে থাকতে বলে নিতাই না করলে পরে মাসী অনেক প্রলোভন দেখিয়ে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে আসার কথা বলে। বাড়ি ফেরার পথে নিতাইয়ের অনেক কথা মনে পড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ রাজন, ঠাকুরঝি তখন তার মনে ঘুরছিল— 'তাই চলেছি দেশান্তরে'—"

নিতাই কাশী যায়। সেখানে এক মা ঠাকুরণের দেখা পায় আসলে নিতাইয়ের সমাজ তার পিছু পিছু যায়। নহিলে মা ঠাকুরণ বলে— "তোমাদের জাতের কেউ তো এভাবে আসে না।" নিতাই সব বলে। পরে ঠাকুরণ তাকে ঘরে ফেরার কথা বলে। নিতাই ঘরের পথ ধরে। সেই স্টেশনে এসে নামে সেই কৃষ্ণচূড়া, রাজন, বেনে মামার দেখা হয়। পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যে বিপ্রপদ মারা যায়, ঠাকুরঝির মৃত্যু সংবাদ শুনে নিতাইয়ের বুকের মধ্যে এরকম ঝড় ওঠে, যে সব শুনে রাজার কাছে থেকে। তখন তার প্রশ্ন জাগে আবার 'জীবন এত ছোট কেনে?' এটিই সুধাতে যায় মায়ের দরবারে। নিতাই এর উত্তর জানে না। কান্নার মধ্যে জেগে ওঠে হাসি কল্পনায় নিতাই দেখে ঠাকুরঝি ও বসন একাকার হয়ে গেছে। দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিতাই-এর জীবনের দুই প্রান্তে দুটি নারী-ঠাকুরঝি ও বসন্ত, ঠাকুরঝির শূন্যস্থান বসন পূর্ণ করেছিল। ঠাকুরঝির মধ্যে ছিল শান্ত শীতল ঘরের সংসারের টান আর বসনের মনের মধ্যে ছিলো একটা উদ্দাস যাযাবরী স্বভাব। ঘটনা শেষে দুইজনেই মারা যায় তখন নিতাই জানতে চায়— 'জীবন এত ছোট কেনে?'— এর উত্তর।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের বাঙালির ভক্তি সাধনায় দুই নারীর প্রাধান্য-একজন কুলত্যাগিনী রাধা ও অন্যজন কুলকন্যা, কুলবধূ উমা। একজন মানুষের মনকে সংসার জীবন থেকে টেনে নেয় দূরে অন্য জন টানে ঘরের দিকে। তাই 'কবি' উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় দুই নারীর স্থান নিতাইয়ের জীবনে— একজন ঘরমুখো অন্যজন টানে বাহিরে, একজন লক্ষ্মী অন্যজন উর্বশী।

কবি উপন্যাসে কবিয়াল নিতাই-এর কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই তারাশঙ্কর মূলত উপন্যাসের গতিবিধি ঠিক করেছেন। উপন্যাসে ঠাকুরঝি আর ঝুমুর দলের বসন দুটি স্বতন্ত্র গল্পের নায়িকা-কৃত্রিমভাবে জোড়া আছে, জোড়া লাগানোর সূত্র নিতাইয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম। নায়ক নিতাই কবিয়াল এর জীবন বৃত্তের দুটি ভাগ একদিকে ঠাকুরঝি অন্যদিকে বসন। এই দুটি বিপরীত ধর্মী নারীর ভালোবাসা নিতাইয়ের জীবনকে একটা পুরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে। নিতাই-এর জীবন বৃত্তের দুটি অংশ ঠাকুরঝি ও বসন এরা নিজেরাই যেন

৩. "চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখবো খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনা কো হে সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

৪. "বলতে তুমি বলোনাকো, আমার মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দুরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মনে আগুনে।"

৫. 'ও আমার মনের মানুষ গো।
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর।"

ঠাকুরঝির সব আছে— রূপ-মন স্বামী ও ঘর-সংসার, ধন-সম্পত্তি সবকিছু। তবুও নিতাই তার কাছে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ একজন কবি। ঠাকুরঝির স্বামী থাকা সত্ত্বেও নিতাই তার মনের মানুষ হয়ে ওঠে। ঠাকুরঝি নিতাইকে বারবার টানে ঘরের দিকে। এরই মধ্যে ঘটে পট পরিবর্তন। একটি ঝুমুর দল ট্রেন থেকে নামায় রাজালালের সঙ্গে দেখা হয় একদিন এবং তার উদ্যোগ সেখানে রাতে আসর বসায় সিদ্ধান্ত হয়। এই ঝুমুর দলের মধ্যে আছে কয়েকজন নিম্ন শ্রেণীর বারবণিতা গায়িকা আর বিভিন্ন যন্ত্র এরা নাচে আর অশ্লীল গান গায়। আসরে পেলাপরে এবং রাতে তাদের চলে আদিম ব্যবসা। দলে থাকে একজন কবিয়াল। এই দলে ছিল বসন— যে দীর্ঘ কৃষ্ণতনু মেয়েটি। অদ্ভুত দুটি চোখ, চোখদুটির মধ্যে যেন ছুরির ধার। চোখ দুটির মধ্যে যেন দুটি কালো পতঙ্গ দুটি কালো ভ্রমর।

বসনের মধ্যে আছে ঠাকুরঝির বিপরীত একটা দুরন্ত উদ্যাম স্বভাব বৈচিত্র্য। ঝুমুর দলের একটা যথার্থ জীবন গড়ে উঠেছে। ওদের একদিকে আছে ক্ষণিকতা অন্যদিকে আছে নির্মাণ স্বার্থপরতা। একদিকে বন্ধনহীনতা অন্যদিকে উচ্ছ্বাস ও উশৃঙ্খলতা— এদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। বসন্তের মধ্যে আছে ভীষ্ম হিংসা আঘাত করবার প্রবৃত্তি এবং উচ্ছ্বাস বেপরোয়া জীবন উপভোগের স্পৃহা। উপন্যাসিক বসন্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শানিত দীপ্তি ছবির তুলটানাই বেশি। অন্যদিকে ঠাকুরঝির সম্পর্কটিতে সতেজ পত্র পল্লবের ছবিই সর্বত্র। ঠাকুরঝির কখনো ভুঁইচাঁপার ডাটা, কখনো তার সর্বাঙ্গে কবিতার মত একটি কোমল ঘনশ্রী কখনো বর্ষায় ঘনশ্যামপত্রী কখনো পাণ্ডুর হেমন্তশ্রী। দীর্ঘ কৃষ্ণতনু বসনের মধ্যে অন্য জিনিস কালো দুটি ভ্রমর তার মুখ হাসনো, সর্বাঙ্গ হাসে। হাসির ধরে মানুষের মনের মনকে কেটে টুকরো টুকরো করে ধুলায় লুটিয়ে দেয়। এভাবেই নিতাইয়ের জীবনে বসনের প্রবেশ— যে টানে বাইরের দিকে।

নিতাই-এর কাছে ঝুমুর দলের ডাক আসে। এর আগেই নিতাই এর ঘরে বসনকে দেখে ঠাকুরঝি উন্মাদ হয়ে যায়। নিতাই ঝুমুর দলের ডাকে সাড়া দেয়। চলে তার যাযাবর জীবন ঝুমুর দলের সঙ্গে বসনের মনের মানুষ হয়ে বা বসন তার মনের মানুষ হয়ে ওঠে। এই বসনই তাকে চড় মারে মদ খায়না বলে। নিতাইয়ের জীবন চড় হল পালা বদল। যে মদ খায়, নিতাই বসন্তকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলে। ওই পাপ অঙ্কিল জীবন থেকে রসে চলে আসতে চায় কিন্তু পারে না বসন্তের সঙ্গে তার গাঁটছাড়া বাঁধার ফলে। সে বসন্তকে কথা দেয় বসন যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার সঙ্গে থাকবে। বসনের অসুখে নিতাই সেবা যত্ন করে।

দিনের পর দিন ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনে বসন্তের উদ্দাম প্রবৃত্তির সাহচর্যে দিন কাটে। তবুও নির্মলা, ললিতা, ওদের কাছে পরপুরুষের আগমন বন্ধ হয় না। মনের মানুষ থাকা সত্ত্বেও

সামান্য কবি গানের সূত্র ধরেই এবং বন্ধু রাজন এর সূত্র ধরেই ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের ভাব হয়। ঠাকুরঝি নিতাইয়ের গানের অন্ধভক্ত। নিতাই নেশা করে না কিন্তু দুধ তার প্রিয়। ঠাকুরঝির কাছে যে নিত্য এক পোয়া দুধ নেয়। আবার তার চায়ের নেশাও বাড়িয়ে দেয় রাজন। এই চা খাওয়াকে কেন্দ্র করেই ঠাকুরঝির দু'দণ্ড বসা নিতাইয়ের ঘরে। নিতাই দু-একটি লাইন কবিতা শোনায়, একদিন রাজন ঠাকুরঝিকে বলে 'আলকাতরার মতো কালো'। ঠাকুরঝি মনে এতে আঘাত পায়। আর নিতাই এনিয়ে গান বেধেছে— 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে'?

এই গানের সূত্র ধরেই নিতাই আর ঠাকুরঝির মধ্যে একটি মধুর হৃদয়াবেগের রহস্যময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভালোবাসা অন্তরে অনুভূতির ভালোবাসা। নিতাইয়ের প্রতি ঠাকুরঝির দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দিন নিতাই ঠাকুরঝির রুক্ষ্ম কালো চুলে খোপায় একগোছা টকটকে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে হাত ধরলেও ক্ষণিক কাণ্ডজ্ঞান হারালেও, নিতাই বুঝতে পারে তার মুগ্ধতায় ঠাকুরঝি রাগ করেনি। তখন নিতাই গান বাঁধে— 'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে।'

রাজন 'আলকাতরার মতো রং' বলার পর নিতাই ঠাকুরঝিকে বলছে— 'আমি কিন্তু কালো ভালোবাসি ঠাকুরঝি।' এতে ঠাকুরঝির মুখের রঙের লাল আভা দেখা না গেলেও তার লজ্জার গাঢ়তা বোঝা যায়। ঠাকুরঝির মাথায় কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখার জন্য নিতাই ঠাকুরঝি হাত ধরে ছিল সাময়িক সময়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে সংগীত ও সংগতের মতো— নিতাই তার হাত ধরলেও সে রাগ করেনি।

নিতাই কে লক্ষ করে যারা নিচু জাত বলে ঠাট্টা করে বিদ্রুপ করে তাতে মর্মাহত হয় ঠাকুরঝি। 'আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা' মন্তব্য আহত করে ঠাকুরঝিকে। এর মধ্যে নিতাইচরণ কয়েকদিনের জন্য বাইরে আলেপুর এর মেলায় যায় গান করার জন্য। সুখ্যাতি চাদর ও পায়ে জুতো নিয়ে ফিরে আসে বাড়ি। চাদর ছাড়া কবিকে মানায় না। নিতাই কুলিগিরি করা ছেড়ে দিয়েছে। ঠাকুরঝি নিতাইয়ের জীবনে একটি সন্ধ্যা প্রদীপের শিখার মতো প্রেরণাময়ী হয়ে ওঠে। এই প্রেরণাময়ী হয়তো বড় বড় কবিদের প্রেরণাময়ী নারীর মতো বিখ্যাত ঘটনা নয় তবুও এই নারী চিরন্তনী প্রেরণাময়ী। দান্তের বিয়াত্রিচে, গ্যেটের শ্বাশত নারী, শেলীর এমিলিয়াভিভানিয়া, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠানের মত নয় কিন্তু জি ঠাকুরঝি নিতাইয়ের জীবনে এক রহস্যময় সৌন্দর্যময়ী কবিত্ব শক্তির প্রেরণাময়ী। ঠাকুরঝিকে ভেবে তার কণ্ঠে অনেক গান জেগে ওঠে। যেমন—

১. "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

২. "আমার ভালোবাসার ধনে হবে তোমার চরণ পূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে পিদিম জ্বালেরে!"

নিতাইয়ের জীবনে দুই নারী ঠাকুরঝি ও বসন্ত— একজন ঘরের অন্যজন বাইরের— 'আমরা যাহাকে ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা এমন পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অন্ততকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা'। একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণব কবিতা'য় প্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা এবং আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসে নিতাইয়ের জীবনে এই ভালোবাসাই এসেছিল যা তাকে বিকশিত করেছে প্রেরণা দিয়েছে শিল্পী নিতাই চরণ, কবিয়াল নিতাই চরণ হওয়ার জন্য। সামান্য বীরবংশী সন্তান। প্রচলিত অর্থে ডোম বংশে তাঁর জন্ম 'দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ'। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস হলেও কবি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা তার ছিল। তাকে জমিদারের নৈশ্য বিদ্যালয়ে যেতে দেখি এবং আমাদের প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করেছে।

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল। তার জীবন বৃত্তের দুদিকে আছে দুই রূপের সন্ধান, আর এদেরকে কেন্দ্র করেই তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে সতোৎসারিত ভালোবাসার গান। সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই নারী সম্পর্কে বলেছেন— 'ঠাকুরঝি ও বসন-যেন দুটো পাখি। একজন খাঁচার শিকে মাথা কুটে নিঃশেষ, আর একজন উড়ে উড়ে নীড় খুঁজে পেল না।' নিতাইয়ের চির বন্ধনমুক্ত সত্তাকে শেষ পর্যন্ত কোন নারী কুক্ষীগত করে রাখতে পারেনি। ব্রাত্য সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিতাইয়ের সংগ্রাম মুখর জীবনের প্রথম পর্বে প্রেম ঘনীভূত হয়েছে ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে এবং পরবর্তীকালে বসন কে কেন্দ্র করে— একজন ঘরের দিকে টানে এবং অন্যজন টানে বাইরে।

'কবি' উপন্যাসে ঠাকুরঝি আর বসন দুটি স্বতন্ত্র গল্পের নায়িকা কৃত্রিমভাবে জোড়া আছে। জোড়া লাগানোর সূত্র নিতাইয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম। এই অভিমত ও বিচার সহ নয়। নিতাই এর ঘরের জানলায় যেদিন ঠাকুরঝি উঁকি দেয় সেদিন বসন ছিল নিতাইয়ের ঘরে। সেই ঘটনায় একটা পালা বদল বা turning point হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নিতাইয়ের মনেও দুই নারীর দুটি সত্তা হয়ে বেঁচে থাকে। তাই দুই কাহিনী পৃথক— এ বক্তব্য নিতাইয়ের জীবন বৃত্তান্ত অনুসরণ করলে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

নিতাই বাড়ি থেকে চলে এলে, স্থান নেয় স্টেশনে রাজালালের এর কাছে। কুলিগিরি করে খায়। দুধ যোগান দেওয়ার সূত্রে ঠাকুরঝির সঙ্গে তার পরিচয়। ঠাকুরঝি রাজার শালিকা। রাজা ওকে ঠাকুরঝি বলে ডাকে, নিতাইও ওকে ঠাকুরঝি বলে ডাকে। কবি নিতাইয়ের জীবনে কবিত্ব বিকাশের প্রেরণাময়ী হিসাবে আমরা পাই ঠাকুরঝিকে। গায়ের রং অত্যন্ত কালো কিন্তু ছিপছিপে দীর্ঘ শরীরের গঠনে আছে একটা শুচিতা, চলনের দ্রুতগামীতায় আছে চঞ্চলতা আর ভুঁইচাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মতো একটি অপরূপ শ্রী'। ঠাকুরঝির পড়নে ক্ষার দিয়ে কাচা ধপধপে সাদা শাড়ি। সে আসে দুধের যোগান দিতে মাথায় দুধের স্বর্ণ বর্ণ একটি ঘটি নিয়ে। ঝকঝকে মাজা একটি সোনার বর্ণের পিতলের ঘটিকে ধরে না— এক হাতে মাপের গ্লাসের অন্য হাতটি দোলে দ্রুতপদে সে হেঁটে চলে যায়। নিতাই নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকে রেললাইন যেখানে বাঁক ঘুরেছে, কৃষ্ণচূড়ার তলায় বসে চেয়ে থাকে রেললাইন দুটো যেখানে প্রায় মিশে গেছে। সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত বিন্দু রেখার মতো দেখা যায়, যার মাথায় স্বর্ণ বর্ণ বিন্দু-ক্রমে সে এগিয়ে এলে দেখা যায় ঠাকুরঝিকে। তারাশঙ্করের উপমায় 'মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশফুল।"

তিনটি পর্ব ভাগ করা যায়— প্রথম: ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮, দ্বিতীয়: ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭, তৃতীয়: ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১।

তারাশঙ্করের যাঁরা সমালোচক তাঁরা তাঁর দ্বিতীয় পর্বকেই শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'চৈতালী ঘূর্ণী' (১৩৩৬) কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা পত্রিকা'য় (১৩৩৬ কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা)। প্রতীক পুরুষ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে। শেষ উপন্যাস 'নবদিগন্ত' প্রকাশ দেব সাহিত্য কুটীর থেকে ১৩৮০ সালে।[২]

রচনাকাল

'কবি' উপন্যাস রচনা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। তারাশঙ্কর 'কবি' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়কে। 'কবি' উপন্যাসের মূলে একটি কথা কানে সর্বক্ষণ অনুরণিত হয়— 'জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে?' এই জীবনের সন্ধান করেছেন লেখক নিতাই কবিয়ালের মধ্যে দিয়ে।

'কবি' নামকরণ

'কবি' নামকরণের মধ্যে 'কবি' শব্দটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি— 'শুধু দস্তুরমতো একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমতো এক সংঘটন। চোর-ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল। নিতাইয়ের বংশ পরিচয় এরূপ— 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙারের পৌত্র, সিঁদেলচোরের পুত্র— নিতাইয়ের চেহারার বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।" এই নিতাই অট্টহাস গ্রামের একান্ন পীঠের অন্যতম মহাপীঠের অদিষ্ঠাত্রী দেবীর মাঘী পূর্ণিমায় মহাদেবী চামুণ্ডার পূজার দিন যে মেলা হয় সেই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবি গানের পালা হয়। নোটন দাস ও মহাদেব পাল এখনকার বাঁধা কবিয়াল। গতবারের পাওনা না পেয়ে কাউকে না জানিয়ে নোটন ভেগেছে। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে নিতাই চরণ-এর আবির্ভাব। নিতাই জোড় হাতে পরম বিনয় সহকারে শুদ্ধ ভাষায় বলে— 'প্রভু, অধীনের একটি নিবেদন আছে— আপনাদের সিচরণে।' সকলের আগে মহাদেব পাল বলে— 'তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে। কিরে পারবিনা?' মা-মামা বংশ ত্যাগ করে নিচু জাতের ছেলে বেড়িয়ে আসে কবি হওয়ার কামনায়। এভাবেই ধীরে ধীরে সে নিতে, নেতা, নিতো, নেতাই হতে নিতাইচরণ হয়ে উঠেছে। কবি আসরে কলকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করেন— 'yes-এ রীতিমত বিস্ময় son of a Dom অ্যাঁ he is a poet'।

'কবি' নায়ক কেন্দ্রিক নামকরণ। নামকরণ তিনভাবে হয়ে থাকে, যথা—

ক. ঘটনা কেন্দ্রিক নামকরণ

খ. চরিত্র কেন্দ্রিক নামকরণ

গ. ব্যঞ্জনা কেন্দ্রিক নামকরণ

তারাশঙ্করের কবিসত্তা 'কবি' উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বয়ং লেখক নায়কের সঙ্গে কখনো একাত্মা, কখনো দ্বৈত। সব মিলে এটি নায়ক কেন্দ্রিক উপন্যাস হয়ে নামকরণ সার্থক হয়েছে।

তারাশঙ্কর 'কবি' : 'জীবন এত ছোট কেনে?'

নিধির সরকার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় কথা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনন্য কালজয়ী স্রষ্টা হিসাবে ভাস্বর হয়ে আছেন। কথা সাহিত্যে তিনি চিরন্তনের যে সৌধ নির্মাণ করেছেন বাংলা সাহিত্যে তা গর্ব। তিনি চিরায়ত সাহিত্যিক। সমাজ সচেতন, দায়িত্ববান। সাহিত্য কর্মী হিসাবে আর্থ-সামাজিক সমকালীন সকল বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সমাজের প্রতিচিত্র অংকন তাঁর ইচ্ছে ছিল না অথবা সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার স্পৃহাকেও মনে হয় তিনি অতিক্রম করেছিলেন তাঁর শিল্পকর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সকলকে শিল্পের অমর্ত অঙ্গনের রম্যতা অনুভব করানো। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর তিনিই প্রথম সার্থক কথাশিল্পী যিনি মানুষের কথা নাম-গোত্রহীন খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন। তাইতো হুমায়ুন কবির বলেছিলেন— 'ও: ও একটা গেঁয়ো।' তারাশঙ্কর মূলত জীবনশিল্পী। যুগ ও জীবনের প্রচলিত প্রবণতাগুলির আশ্রয় তিনি ৪০-এর যুগে রবীন্দ্র শরৎ উত্তর বাংলা সাহিত্যে নতুন এক প্রতিমা নির্মাণে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের পরিচিত কালের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীণ সমাজকে বদলের পথে এগিয়ে দেয় তার চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ব্রাহ্মণ শাসিত ও জমিদার শাসিত বাংলাদেশ ও দেশের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ধারা কেমন ছিল তার চিত্র তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের নিজের কথায়— "এ সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই তাদের হয়ে মানুষের দরবারে নালিশ জানাতেই সাহিত্যের জগতে তাঁর আগমন।"

পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে আমরা পাই প্রকৃতি জগৎ, সেই জগতের বর্ণনা-যা আমাদের বাড়ির চারপাশে তাদের জগৎ রচনা করে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয় করলেন মাটির শষ্যে এবং শস্যরূপ ভূমিকে। সাধারণ অন্ত্যজ সমাজের ডোম কাহার বীরবংশী গ্রামীণ কৃষক সমাজের অভ্যন্তরীণ স্তর বিন্যাস কে অনেকটা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর দেখা অন্ত্যজ মানুষের প্রেম-অপ্রেম, তাদের আশা-নিরাশা, প্রেমের বিচিত্রতা তারাশঙ্করের বিভিন্ন সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা পাই। তারাশঙ্করের জন্মভূমি লাভপুর (অট্টহাস), সেই স্থানের অন্ত্যজ গ্রামীণ মানুষের চরিত্র চিত্রণে, নিগূঢ়তা ও একান্ত গোপনীয় আবেগ উত্তাপ কামনা বাসনা চিত্রিত হয়েছে— যারা রোমান্টিক প্রেমের স্বর্গ থেকে বঞ্চিত।

তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার কাল ৪৩ বছর অর্থাৎ ১৯২৮ থেকে ১৯৭১। তাঁর নিজের কথায়— 'বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন 'কল্লোল' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর'। ... সুতরাং ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন-এর কল্লোলে সুতরাং ১৯৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করি।"[১] তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনকে